বাংলায় মোগল শাসন

ইউনিট ৪

ভূমিকা

সম্রাট আকবরের সময় মোগলরা বাংলায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাঁর রাজত্বকালে মোগলরা বাংলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সমগ্র বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর। বাংলায় মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার স্থানীয় স্বাধীন জমিদারগণ রুখে দাঁড়িয়েছিল। ইতিহাসে তাঁরা বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর সামরিক দক্ষতা ও প্রচেষ্টায় মোগল বাহিনী এই স্বাধীনচেতা বার ভূঁইয়াদের দমন করতে সক্ষম হন। এরপর প্রায় দীর্ঘ একশ বছর বাংলা সর্বভারতীয় মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। যার প্রভাব বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় জীবন, অর্থনীতি, স্থাপত্য সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। এই ইউনিটে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মোগল আমলে বাংলার প্রশাসন, সমাজ, স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৪.১ বাংলায় বার ভূঁইয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলার বার ভূঁইয়াদের পরিচয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বার ভূঁইয়ারা কোনো কোনো এলাকায় স্বাধীন রাজত্ব করেছে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈসাখান মসনদে আলার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মোগলদের বিরুদ্ধে বার ভূঁইয়াদের সংগ্রামের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ভাটি অঞ্চল, ত্রিপুরা রাজ্য, ভাওয়াল, কাত্রাবো, বাজিতপুর

করররানি বংশের শেষ শাসক দাউদ করররানির মৃত্যুর পর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক আফগান জমিদার, হিন্দু সামন্ত প্রধান, স্থানীয় জমিদার এবং ভূঁইয়ারা স্বাধীনভাবে শাসন করছিল। এই স্থানীয় শাসকবর্গ মোগল কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে। সম্রাট আকবরের সময়ের ঐতিহাসিক আবুল ফযল বলেছিলেন ভাটির ভূঁইয়ারাই মোগলদের বাংলা জয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ইতিহাসে এই ভূঁইয়ারা বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত। ভাটি বলতে যে অঞ্চল বোঝায় তার সীমানা হলো পশ্চিমে ইছামতি নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য এবং উত্তরে বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ উত্তর-পূর্বে সিলেটের বানিয়াচংগ। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিনটি বড় নদী ও তাদের শাখা প্রশাখা বেষ্টিত ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও ত্রিপুরার নিম্নাঞ্চল নিয়েই ভাটি অঞ্চল। সম্রাট আকবরের সময়ের বার ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন সোনারগাঁও এর জমিদার ঈসাখান মসনদে আলা। এ সময়ের অনান্য ভূইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায় ও কেদার রায়; ভাওয়ালের গাজী পরিবার, যশোরের প্রতাপাদিত্য, বাকলার কন্দর্প নারায়ণ, ফতেহবাদের মুরাদ খান, বুকাইনগরে খাজা ওসমান ও ভুলুয়ার লক্ষণ মানিক্য এরা সকলেই সম্রাট আকবরের সময় বাংলায় মোগল আগ্রাসনকে রুখে দিয়েছিলেন। ভাটির জমিদারদের মধ্যে ঈসাখান ও তার ছেলে মুসাখান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৫৭৬ এ রাজমহলের যুদ্ধের পর বাংলার আফগান শাসনের সমাপ্তি হলেও ঈসাখান ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একা সাম্রাজ্যবাদী মোগলদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে পারবেন না। তাই তিনি পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জমিদার ও আফগান দলপতিদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক ও সামরিক মৈত্রী তৈরি করেন। ঈসাখানের নেতৃত্বে এই সামরিক শক্তির প্রধান অবলম্বন ছিল তাদের যুদ্ধ রণতরী। ১৫৭৮ সালে বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কাস্তলে ঈসাখানের সাথে মোগলদের যুদ্ধ হয়। প্রাথমিক প্রর্যায়ে ঈসাখান হেরে গেলেও পরবর্তীতে সম্মিলিত শক্তির কাছে মোগলরা পরাজিত হয়। ১৫৮৩ ও ১৫৮৪ খিস্টাব্দেও ঈসাখান আগ্রাসী সৈন্যবাহিনীকে যথাক্রমে বাজিতপুরে ও কাত্রাবোতে পরাস্ত করেন। ১৫৮৬ সালেও মোগলরা ঈসাখানকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হন। ঈসাখানের সাথে মোঘল বাহিনীর শেষ যুদ্ধ হয় রাজা মানসিংহের নেতৃত্বে। এই যুদ্ধেও মোগলরা তাঁর কাছে পরাজিত হন এবং অনেক মোগল সৈন্য বন্দি হন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঈসাখান মৃত্যুবরণ করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে মির্জা নাথানের লেখা *বাহারীস্তান ই গায়েবী* গ্রন্থে সতের শতকের প্রথম দশকে ভাটি অঞ্চলে স্বাধীন জমিদারদের যে তালিকা পাওয়া যায় এ মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হিসেবে বলা হয় মুসা খান 'মসনদ-ই-আলা'কে। ১৫৯৯ সালে তিনি জমিদার হন। তার রাজ্যসীমা ছিল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ, ত্রিপুরার কিছু অংশ এবং সুসঙ্গ ছাড়া ময়মনসিংহের সম্পূর্ণ এলাকা। এসময়ের আরেকজন শক্তিশালী জমিদার ছিলেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য। তাঁর রাজ্যের পরিধি বর্তমান যশোর, খুলনা ও বাখেরগঞ্জ জেলা নিয়েছিল। তার রাজ্য পশ্চিম দিকে ভাগিরথী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ ছাড়াও সিলেট এলাকায় বায়জিদ কররানি ও তার অধীনস্থ আফগানদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। এ সময় ভুলুয়া রাজ্য ছিল রাজা অনন্ত মানিক্যের নিয়ন্ত্রণে। এই রাজ্যটির অবস্থান বর্তমান বৃহত্তর নোয়াখালী। বানিয়াচঙ্গের জমিদার আনোয়ার গাজীও ছিলেন স্বাধীন জমিদারদের মধ্যে একজন।

মোগল সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই জমিদারগণ ছিলেন স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক। যদিও তারা কোনো রাজবংশের সন্তান ছিলেন না তা সত্বেও তারা বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে প্রায় তিন দশক সময়কাল মোগল আক্রমণ সফল হতে দেন নি। ভাঁটি অঞ্চলের স্থানীয় জমিদারদের বশ্যতা স্বীকার করানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় মোগলদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায়। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে মোঘলদের জয়লাভের পর আকবরনগর (রাজমহল) এ মোগল সুবাহ বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বারো ভূঁইয়াদের স্বাধীন থাকার সংগ্রামকে মোগলরা নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়েছিল ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সুবাহদার ইসলাম খান চিশতীর সামরিক দক্ষতা ও কুটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে মোগলরা বারো ভুঁইয়াদের দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় এবং সমগ্র বাংলায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাহরিস্তান ই গায়েবী বইটির অনুবাদ সংগ্রহ করে পড়ার চেষ্টা করবে।

সারাংশ

মোগল সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনচেতা জমিদারগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তারা কোনো রাজবংশের সন্তান না হয়েও বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে প্রায় তিন দশক মোগল আক্রমণ সফল হয় নি তাদের কারণেই। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের ইসলাম খান চিশতীর সামরিক দক্ষতা ও কুটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে মোগলরা বারো ভুঁইয়াদের দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মোগল সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক ছিলেন কারা?
ক) জমিদারগণ খ) সৈনিকগণ গ) নেতাগণ ঘ) সাধারণ জনগণ

২। কোন যুদ্ধের পর বাংলার আফগান শাসনের সমাপ্তি ঘটে?
ক) রাজমহলের যুদ্ধ খ) বক্সারের যুদ্ধ গ) চৌসার যুদ্ধ ঘ) পানিপথের যুদ্ধ

৩। কিশোরগঞ্জ জেলার কাস্তলে ঈসা খানের সাথে কাদের যুদ্ধ হয়?
ক) পর্তুগিজদের খ) মোগলদের গ) ইংরেজদের ঘ) ফরাসিদের

৪। কররানি বংশের শেষ শাসক কে ছিলেন?

ক) দাউদ কররানি খ) ইসমাঈল কররানি গ) সুলেমান কররানি ঘ) আওরঙ্গজেব

৫। *বাহারীস্তান ই গায়েবী কে লিখেছেন?*

ক) আবুল ফজল খ) মির্জা বুরহান গ) মির্জা কামরান ঘ) মির্জা নাথান

সৃজনশীল প্রশ্ন

সম্পদে পরিপূর্ণ একটি দেশে হঠাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার বদল হয়। দেশের শাসন ক্ষমতায় থাকা রাজা অন্য রাজ্যের রাজার কাছে পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সম্পদে পরিপূর্ণ ঐ দেশের নানা স্থানে বিদ্রোহ করে বসেন ক্ষমতাধর কয়েকজন জমিদার। তারা বিজয়ী রাজ্যের রাজার পক্ষে দেশটির দখল নেয়া প্রায় অসম্ভব করে দেয়। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

ক. বার ভূঁইয়া কারা? ১

খ. মোগলদের সঙ্গে বার ভূঁইয়াদের সংঘাতের কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অংশের সঙ্গে কিভাবে বার ভূঁইয়াদের সম্পৃক্ত করা যায়। ৩

ঘ. বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈসাখান মসনদে আলা কতটুকু সফল ছিলেন? ৪

পাঠ-৪.২ বাংলায় মোগল সুবাহ প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্রাট আকবরের সময় বাংলায় মোগলদের রাজ্য কতটুকু বিস্তার হলো তা বলতে পারবেন।
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় মোগলরা সম্পূর্ণ বাংলায় কীভাবে রাজ্য বিস্তার করেছিল বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুবাহদার ইসলাম খান চিশতীর সামরিক সাফল্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	শাহবাজ খান, সাদিক খান, উজির খান, সাইদ খান, রাজা মানসিংহ

মোগল সম্রাট আকবর সর্বভারতীয় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ১৫৭২ সালে আকবর সেনাপতি মুনিম খানের নেতৃত্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এই অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫৭৫ সালে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তুকারয়ে মোগল বাহিনীর সাথে বাংলার শাসক দাউদ কররানির যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মোগল বাহিনী জয়লাভ করে এবং ১৫৭৫ এ কটকের সন্ধি অনুযায়ী বাংলা ও বিহারে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বাংলায় কররানি শাসনের চূড়ান্ত অবসান হয় ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে মোগল বাহিনীর জয় লাভের মাধ্যমে। এ সময় বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মোগলদের নিয়ন্ত্রণে আসে। আকবরের সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন শাহবাজ খান, সাদিক খান, উজির খান, সাইদ খান এবং রাজা মানসিংহ। এরা সকলেই পূর্ব-বাংলার স্বাধীন জমিদারদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধ পরিচালনা করেও ব্যর্থ হন। ফলে সম্রাট আকবরের সময় বাংলার পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরাংশে মোগলরা আধিপত্য বিস্তার করলেও বাংলার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বাংশের বিশাল এলাকা স্বাধীন স্থানীয় শাসকদের হাতে ছিল। এ সময়ের সুবাহ বাঙলার বিস্তৃতি সমগ্র বাংলা ব্যাপী ছিল না; বাংলার পশ্চিম, উত্তর পশ্চিম ও উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত সুবাহ শাসিত হত আকবরনগর (রাজমহল) রাজধানী থেকে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দীন কোকাকে বাংলার সুবাহদার নিয়োগ দেন। তিনি বর্ধমানে বিদ্রোহী ফৌজদার আলী কুলীকে দমন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এর পর জাহাঙ্গীর বিহারের সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। ১৬০৮ সালে সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খানের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীর বিখ্যাত সুফি সেলিম চিশতীর দৌহিত্র ইসলাম খান চিশতী বাংলার সুবাদার নিয়োগ দেন। ইসলাম খান তখন বিহারের সুবাদার হিসেবে

দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি পূর্ববাংলার ভুঁইয়াদের দমন করার জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ:

ক. সমগ্র বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তার।
খ. মোগল আধিপত্যের প্রধান শত্রু ভাটি অঞ্চলের বার ভূঁইয়াদের নিয়ন্ত্রণ করা।
গ. ভাটি অঞ্চলে যুদ্ধের সহায়ক নওয়ারা বা নৌবহরকে শাক্তিশালী করা।
ঘ. রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করা। কেননা রাজমহল সুবাহ বাংলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এটি ভাটি অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। এখান থেকে অভিযান পরিচালনা করলে সাফল্যর সম্ভাবনা কম। তাই তিনি বাংলার কেন্দ্রস্থলে এবং যেখান নদী পথে ভাটি অঞ্চলে দ্রুত যোগাযোগের জন্য ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন।
ঙ. পূর্ববর্তী দুর্নীতি পরায়ণ বিশ্বাসঘাতক কর্মকর্তাদের পরিবর্তে সৎ যোগ্য সাহসী কর্মকর্তাদের বাংলার প্রশাসনে নিয়োগের জন্য সম্রাটের কাছে প্রস্তাব প্রদান।

ইসলাম খান ১৬০৮ সালে রাজমহল থেকে নদী পথে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১৬১০ সালে তিনি মোগল বাহিনী সহকারে ঢাকায় প্রবেশ করেন এবং ঢাকার নাম রাখা হয় জাহাঙ্গীরনগর।

ঢাকায় আসার আগেই সামরিক অভিযান ও কূটনৈতিক পদক্ষেপে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলাকে তিনি শত্রুমুক্ত করেছিলেন। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বীরভূম, পাচেট ও হিজলীর জমিদার যুদ্ধে পরাস্থ হয়ে সুবাহদারের সাথে সাক্ষাত করে মোগল শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ভূষনার রাজা শত্রুজিত ও যুদ্ধে পরাস্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

ইসলাম খান ঢাকায় পৌছে ঢাকা দুর্গে অবস্থান নেন। নৌবাহিনীকে মোতায়েন করা হয় 'চাঁদনী ঘাটে' এলাকায়। এ সময় মুসা খানের নেতৃত্বে বার ভুঁইয়ারা শীতলক্ষ্যা নদীকে কেন্দ্র করে মোঘল বাহিনীকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। দুই দলের ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ হতে থাকে। ১৬১১ সালে মোগলরা ভূলুয়া জয় করলে বার ভুঁইয়ার মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মুসা খান উপলব্ধি করেন মোগলদের আধিপত্য মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিনি সুবাহদারের দরবারে আত্মসমর্পণের জন্য উপস্থিত হলে ইসলাম খান তাকে স সম্মানে গ্রহণ করেন। মুসা খানের পর বাহিনী সিলেটের খাজা উসমান, বায়জীদ কররানি, বাকলার রামচন্দ্র প্রমুখদের পরাজিত করেন এবং বার ভূঁইয়াদেরকে সুবাহদার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ইসলাম খানের প্রচেষ্টায় উত্তরে ঘোড়াঘাট থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম, পাচেট, হিজলী, পশ্চিমে রাজমহল থেকে উত্তর-পূর্বে সিলেট এবং দক্ষিণ পূর্বে ফেনী নদী পর্যন্ত মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও তিনি বাংলার উত্তর, উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী কোচবিহার, কামরুপ ও কাছাড় অঞ্চলে মোগল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

সুবাহদার ইসলাম খানের প্রতিষ্ঠিত সুবাহ বাংলায় পরবর্তী এক শহক মোগল আধিপত্য বজায় ছিল। বাংলার মোগল সুবাহদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাশিম খান জুয়ুনী, শাহ সুজা, মীর জুমলা, শায়েস্তা খান, ইব্রাহীম খান ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ আজিমউদ্দিন। সুবাদার শায়েস্তা খানের সময় মোঘলরা চট্টগ্রাম বিজয় করে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া শায়েস্তা খানের সময় বাংলায় ইউরোপীয় আধিপত্য ও প্রভাব বলয় বিস্তৃত হয়। তাঁর সময় ঢাকায় প্রচুর স্থাপত্যকর্ম নির্মিত হয় লালবাগ কেল্লা, পরিবিবির সমাধি, ছোট কাটরা, বড় কাটরা ও একাধিক মসজিদ তার সময়ে নির্মিত। শায়েস্তা খানের সময় বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে উঠে। *রিয়াজুস সালাতীন* গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী তার সময় টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুবাহ বাংলার উপর একটি নিবন্ধ রচনা করবেন।

সারাংশ

মোগল সম্রাট আকবর সর্বভারতীয় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা পূর্ণতা পায় জাহাঙ্গীরের আমলে। ১৫৭২ সালে আকবর সেনাপতি মুনিম খানের নেতৃত্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এই অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫৭৫ সালে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তুকারয়ে মোগল বাহিনীর সাথে বাংলার শাসক দাউদ কররানির যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মোগল বাহিনী জয়লাভ করে এবং ১৫৭৫ এ কটকের সন্ধি অনুযায়ী বাংলা ও বিহারে মোগল আধিপত্য

প্রতিষ্ঠা হয়। তবে বাংলায় মোগলদের আধিপত্য বিস্তারের মূল কৃতিত্ব সুবাদার ইসলাম খানের। সুবাদার ইসলাম খানের প্রতিষ্ঠিত সুবাহ বাংলায় পরবর্তী এক শতক মোগল আধিপত্য বজায় ছিল। বাংলার মোগল সুবাহদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাশিম খান জুয়ুনী, শাহ সুজা, মীর জুমলা, শায়েস্তা খান, ইব্রাহীম খান ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ আজিমউদ্দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৫৭২ সালে আকবর তার নেতৃত্বে বাংলা বিহার উড়িষ্যায় অভিযান পরিচালনা করেন?
ক) মুমিন খান খ) সাইদ খান গ) উজির খান ঘ) সাদিক খান

২। বাংলায় মুঘল আধিপত্য বিস্তারের মূল কৃতিত্ব কার?
ক) শাহ সুজা খ) ইসলাম খান গ) ইব্রাহীম খান ঘ) শায়েস্তা খান

৩। পূর্ব বাংলার ভূঁইয়াদের দমনে ইসলাম খানের পরিকল্পনা ছিল–
i. ভাটি অঞ্চলের ভূঁইয়াদের নিয়ন্ত্রন করা
ii. রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করা
iii. ভাটি অঞ্চলের নৌবহরকে শক্তিশালী করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ বাংলায় সুবাদারি শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলার সুবাদারদের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুবাদারগণ কীভাবে বাংলায় পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করেছিলেন তা লিখতে পারবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ সুবাদারদের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুবাদার মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব সংস্কার উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	দারার খান, মহব্বত খান, মুকাররম খান, ফিতাই খান, কাশিম খান জুয়িনী

সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ সালে বার ভুঁইয়াদের দমন করে সমগ্র বাংলায় সুবাদারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৬১৩ সালে ইসলাম খানের মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন সুবাদার বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। তবে ১৬৬০ সালে সুবাদার মীর জুমলা ক্ষমতা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত কোনো সুবাদারই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে ১৬১৩ সাল থেকে ১৬১৭ সাল পর্যন্ত ইসলাম খান চিশতি এবং ১৬১৭ সাল থেকে ১৬২৪ সাল পর্যন্ত দিল্লির সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গ বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর খুব অল্প সময়ের জন্য সুবাদার নিযুক্ত হন দারার খান, মহব্বত খান, মুকাররম খান এবং ফিতাই খান। সম্রাট শাহজাহান মোগল সিংহাসনে আরোহন করার পর বাংলার সুবাদার হিসেবে ১৬২৮ সালে নিয়োগ দেন কাসিম খান জুয়িনিকে। সুলতানি শাসনপর্বে হুসাইন শাহী যুগ থেকে বাংলায় পর্তুগিজরা বাণিজ্য করতো। এ সময় পর্তুগিজ বণিকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। ক্রমে তা বাংলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাশিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন।

কাসিম খানের পর সুবাদার ইসলাম খান মাসহাদি (১৯৩৫-১৬৩৯) চার বছর শাসন করেন। অতঃপর সম্রাট শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহসুজাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। সুজা কুড়ি বছর দায়িত্বে ছিলেন। মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল সুজার শাসনকাল। বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজরা এ সময় সুবাদারের কাছ থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা লাভ করেছিল। এতে বাণিজ্যের পাশাপাশি ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ১৬৫৭ সালে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্রের প্রত্যেকেই মোগল সম্রাট হওয়ার জন্য বিদ্রোহ করে। এসময় আওরঙ্গজেবের সাথে শাহ সুজার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই ভাইয়ের যুদ্ধে ১৬৫৯ সালে শাহসুজা পরাজিত হন।

আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা সুজাকে দমন করার জন্য বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) পর্যন্ত এসেছিলেন। তাই সম্রাট আওরঙ্গজেব মীরজুমলাকে (১৬৬০-১৬৬৩) বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব দেন। দক্ষ সুবাদার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। মীরজুমলা আসাম ও কুচবিহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। মীরজুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলির খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবাদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন। এরপর আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খানকে (১৬৬৪-১৬৮৮) বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মাঝখানে ১৬৭৮ সালে সম্রাট তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এরপর ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার সুবাদার হন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও দূরদর্শী শাসক।

বাংলার জনজীবনের ওপর মারাত্মক হুমকি জলদস্যুদের বিতাড়িত করে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করেন। তিনি ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাত থেকেও বাংলার মানুষদের রক্ষা করেছিলেন। সুবাদারির শেষ দিকে শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ বাঁধে। ইংরেজদের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, তারা ক্রমে এদেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পর শায়েস্তা খান বাংলা সুবা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। শায়েস্তা খানের পর একে একে বাংলার সুবাদার হন খানজাহান বাহাদুর, ইব্রাহীম খান ও আজিমুদ্দিন। তাঁদের সময় বাংলার ইতিহাস তেমন ঘটনাবহুল ছিল না।

দক্ষ সুবাদার হিসেবে এবার বাংলার শাসন ক্ষমতায় আসেন মুর্শিদকুলী খান (১৭০০-১৭২৭)। প্রথমে তাঁকে বাংলার দিউয়ান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। দিউয়ানের কাজ ছিল সুবার রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাদার পদ দেয়া হয়। এদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য তিনি খ্যাতিমান হয়ে আছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দুর্বল মোগল সম্রাটগণ দূরবর্তী সুবাগুলোর দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারেন নি। ফলে এসব অঞ্চলের সুবাদারগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। মুর্শিদকুলী খানও অনেকটা স্বাধীন হয়ে পরেন। তিনি নামেমাত্র সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন এবং সম্রাটকে বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। মুর্শিদকুলী খানের পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলার সিংহাসনে বসেন। এভাবে বাংলার সুবাদারী বংশগত হয়ে পরে। আর এরই পথ ধরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন শাসন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুবাদারগণ কীভাবে বাংলায় পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করেছিলেন তার উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।

সারাংশ

বাংলায় মোগল সুবাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক একে বেশ কয়েকজন সুবাদার দায়িত্ব পালন করেন। তারা সাধারণ শাসন কার্য ছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর মধ্যে পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে ঢাকা নগরি রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। দস্যু বিতাড়নেও ভূমিকা রেখেছিলেন। রাজস্ব সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও সুবাদার মীরজুমলা দক্ষতার সাথে করতে পেরেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলাকে প্রেরণ করেন কাকে দমন করার জন্য?

ক) সুজা খ) মুরাদ গ) দারা ঘ) দারাশুকোহ

২। ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার পদ দেয়া হয়–

ক) মুর্শিদকুলী খানকে খ) রুকনউদ্দিনকে গ) ইকবালকে ঘ) সুজাউদ্দিনকে

৩। বাংলার সুবাদারদের কৃতিত্ব হলো–
i. সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গ বাংলার সুবাদার ছিলেন
ii. জলদস্যুদের বিতাড়িত করে শায়েস্তাখান চট্টগ্রাম দখল করেন
iii. কাশিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলায় কীভাবে মুসলিম সমাজের বিস্তার ঘটেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কেন বাংলার সাধারণ মানুষের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মধ্যযুগে বাংলার সাধারণ হিন্দু সমাজ কেমন করে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মোগলদের প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	আরব, সমরখন্দ, গজনী, ফকিরি, দরবেশিয়া, বাউল

আট শতকে আরবের বণিক মোসলমানরা বাংলার সমুদ্র উপকূলীয় কোনো কোনো অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু সে পর্যায়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা তেমন বাড়ে নি। মুসলিম সমাজ বিস্তারের ঘটনাও তেমন ঘটে নি। এ অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এগার শতক থেকে। এ সময় আরব, সমরখন্দ, গজনী, আফগানিস্তান থেকে উত্তর ভারত ঘুরে সুফি সাধকদের কেউ কেউ বাংলায় আসতে থাকেন। গ্রাম-গঞ্জে খানকাহ স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। এ পর্যায়ে তাঁরা অনেকটা সফল হন। হিন্দু-বৌদ্ধ ও অন্তঃজ শ্রেণির অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ বিস্তার লাভ করে। এই গতি ধারা আরও বৃদ্ধি পায় তের শতকের শুরু থেকে। এ সময় বাংলার শাসন ক্ষমতা চলে আসে মুসলমানদের হাতে। রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ধর্ম প্রচারের গতি বৃদ্ধি পায়। ইসলামের সাম্যনীতি, সেই সঙ্গে রাজ অনুগ্রহ লাভের আশা-আশ্বাসে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর অনেকে ধর্মান্তরিত হয়। এভাবে মুসলিম সমাজ ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলমান সুফি সাধকদের এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমনের ফলে ইসলামের সাম্যের বাণী তৎকালীন সাধারণ মানুষ বিশেষত ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার বঞ্চিত নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তাই বর্ণ-বৈষম্যের শিকার সাধারণ বাঙালির এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। দিল্লির সুলতানদের প্রেরিত গভর্নর ও বাংলা স্বাধীন সুলতানদের নেতৃত্বে ও অঞ্চলে রাজ্য সম্প্রসারণের মধ্যদিয়ে মুসলিম সমাজ বিস্তার প্রক্রিয়াও অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে।

মুসলমানরা আসার পর প্রথম বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে দেখা গেল সমাজে দীর্ঘদিন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার বঞ্চিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এরই পথ ধরে মধ্যযুগের শুরু থেকেই হিন্দু সমাজের অবহেলিত শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা দেখা যেতে পারে। এ যুগে এতকালের বঞ্চিত ও অবহেলিতরা লেখাপড়া করার সমান সুযোগ পায়। শুধু তাই নয় নিম্নশ্রেণির অনেকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ধারণা করা যায় রাজ আনুকূল্যের কারণে হিন্দু সমাজ তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা কাটিয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার মতো সামর্থ অর্জন করতে পেরেছিল। এটা সমাজ গঠনের জন্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

সুফিবাদ প্রসারে শংকিত এদেশের হিন্দুদের এক বিরাট অংশ নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে। তার প্রকাশ বলা চলে শ্রী চৈতন্যের নব্য বৈষ্ণব আন্দোলন। মুসলমানদের ধর্ম ও জীবনের আলোকে হিন্দু সমাজ সংস্কার করে হিন্দু সমাজে ইসলাম প্রচারের পথ বন্ধ করার জন্য বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব হয়। ভক্তিধর্মের অনুসারীরা হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্য ইসলামী মূল্যবোধের অনেক কিছু গ্রহণ করে।

প্রজারঞ্জক হিসেবে মোগল সম্রাটদের সুনাম ছিল। তাঁরা প্রজা মঙ্গলের কথা ভাবতেন। প্রদেশের শাসনকর্তা বা সুবাদারদের মনোভাবও ছিল একই ধরনের। এর ফলে মোগল যুগে বাংলার সমাজ আরও সুগঠিত ও সমৃদ্ধ হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলোতে মানুষের উন্নতির পথ সুগম হয়। এ পর্যায়ে তাই বাঙালির সমাজজীবনে মোগল প্রভাব লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধনী ও জমিদার শ্রেণির পোশাক-পরিচ্ছদ বিশেষভাবে পাল্টে যেতে থাকে। তাঁরা পছন্দ করতে থাকেন মোগল পোশাক। জরিদার মুক্তা বসান ঝলমলে পোশাক, সালোয়ার কামিজ শোভা পেতে থাকে এদেশের হিন্দু-মুসলমানের গায়ে। খাওয়া-দাওয়ায়ও কিছুটা পরিবর্তন আসে। বাঙালির মাছ, ভাত আর ব্যাঞ্জনের পাশাপাশি কাবাব, রেজালা, কোর্মা, আর ঘিয়ের রান্না যাবতীয় মোগলাই খাবার জায়গা করে নেয়। মোগলযুগে বাংলার ধনী এবং মধ্যবিত্ত মহিলারাও আকর্ষণীয় পোশাক পরত। কখনো কখনো তাদের বাহন ছিল পালকি। গ্রামের মানুষ সাধারণ পোশাক পরত। পায়ে ব্যবহার করত কাঠের খড়ম। সুলতানি যুগের মতো মোগল আমলের বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক মধুর ছিল। মোগলযুগের শেষ দিকে নবাব মুর্শিদ কুলী খান ও আলীবর্দী খানের সময়ে উত্তর ভারত ও মধ্য এশিয়া থেকে ব্যবসায়ী, কর্মচারী, কবি, চিকিৎসক অনেকেই এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এদের অনেকেই ছিলেন শিয়া মুসলমান। তাদের প্রভাবে বাংলার সমাজে শিয়া আচার অনুষ্ঠান প্রবেশ করে। মহররমের নানা অনুষ্ঠান এসময় জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে।

মোগল যুগে বাঙালি সমাজে সকল ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারত। তবে ইসলামের প্রভাবে অমুসলিম সমাজের একেশ্বরবাদী ধারণার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এর আলোকে বাংলার হিন্দু সমাজে কিছুটা পরিবর্তনের ধারা দেখা যায়। সুলতানি যুগ থেকেই শ্রী চৈতন্যের নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব হিন্দুদের সামাজিক ধর্মীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই প্রভাব মোগল যুগে আরও বৃদ্ধি পায়। ভক্তিবাদ ও সাম্যবাণী মানুষ গ্রহণ করতে থাকে। ফলে ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামীর মূলে আঘাত আসে। সাধারণ হিন্দুরা গোঁড়া হিন্দুদের দেখানো ধর্মের বদলে মনসা, চণ্ডী ও শক্তির পূজায় মনোনিবেশ করে। মোগল যুগে পারস্যের সুফিবাদের সঙ্গে বাংলার ভক্তিবাদ মিশে একটি মিশ্র সুফিবাদের সৃষ্টি করে। এভাবে বাঙালি সমাজে ফকিরি, দরবেশিয়া ও বাউল প্রভৃতি মরমী মতবাদের উৎপত্তি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোগল বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন

সারাংশ

মধ্যযুগে বাংলায় বিদেশি মুসলমান সুলতান ও মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্বে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন আসে। সেনযুগের অবহেলিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এতে নতুন মুসলমান সমাজের বিকাশ ঘটে। এই পর্বে হিন্দু সমাজেও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে রূপান্তর ঘটে। মোগল যুগে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। সকল ক্ষেত্রে মোগল প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। উত্তর ভারত ঘুরে সুফি সাধকরা কোথায় এসেছিলেন?

ক) বাংলা খ) নেপাল

গ) বিহার ঘ) উড়িষ্যা

২। সুলতানি যুগের মতো মোগল আমলের বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক কেমন ছিল?

ক) অস্বাভাবিক খ) কলুষিত

গ) মধুর ঘ) দ্বন্দ্বে ভরা

৩। মধ্যযুগে বাংলার মানুষের বৈশিষ্ট্য ছিল–

i. বাংলার মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করত

ii. পালকি ছিল গণমানুষের বাহন

iii. বাংলার মানুষের প্রিয় খাবার ছিল কাবাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৫ মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্প

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুলতানি যুগের বাংলায় স্থাপত্য কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলায় মধ্যযুগে নির্মিত স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সুলতানি বাংলার মসজিদ স্থাপত্য সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারবেন।
- মোগলযুগে নির্মিত নানা বৈচিত্রপূর্ণ স্থাপত্যের বর্ণনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দমালা	মসজিদ, খানকাহ, বেলেপাথর, গ্রানাইট

মধ্যযুগ পর্বে বাংলার স্থাপত্য শিল্পে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছিল। কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যের অধিকাংশই যেমন আমরা খুঁজে পাই না, মধ্যযুগের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় নি। এযুগের স্থাপত্যকলায় গুণগত যে পরিবর্তন এসেছিল তাতে প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেশকিছু সংখ্যক স্থাপত্য টিকে আছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার সংরক্ষণের মধ্যদিয়েও টিকিয়ে রাখা গিয়েছে কিছু সংখ্যক স্থাপত্য।

সুলতানি যুগের প্রতিনিধিত্বশীল স্থাপত্যগুলোর প্রধান উপকরণ ছিল ইট। ইট তৈরির উপযোগী কাদামাটি ছিল এদেশে। ইমারত তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পাথরের যোগান কোথাও ছিল না। মালদহ জেলার রাজমহল পাহাড়ে কালো ব্যাসল্ট পাথর পাওয়া গেলেও তা দিয়ে সমগ্র দেশের স্থাপত্য নির্মাণের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এই পাথর পরিবহনের সহজ সুযোগও ছিল না। কচিৎ কখনো বিহার থেকে বেলেপাথর ও গ্রানাইট পাথর আমদানি করা হতো। তাই বাংলার ইমারতে এ ধরনের নির্মাণ উপকরণের ব্যবহার ছিল সীমিত। ইটের ইমারতে পিলার, সিঁড়ি, মসজিদের মিম্বর, মিহরাব প্রভৃতিতে কখনো কালো ব্যাসল্ট বা বেলেপাথর ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে।

সুলতানি যুগের ইমারতে ইটের গাঁথুনিতে চুন সুরকির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। মুসলিম যুগের স্থাপত্যের বিশেষ দিক ছিল যে, এসময় ছাদ-গম্বুজ প্রভৃতির পলেস্তরা দেয়ার জন্য চুনের বিশেষ ব্যবহার ছিল। তবে দেয়াল পলেস্তরা দিয়ে ঢেকে দেয়ার পদ্ধতি মোগল যুগের পূর্বে দেখা যায় নি। পনের শতক থেকে বাংলার স্থাপত্যে উজ্জ্বল টালির ব্যবহার বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছিল।

মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্যে ইটের ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যকলার মৌলিক ও সর্বজনীন রূপ নয়। প্রধানত শহরাঞ্চলেই ইটের ব্যবহার দৃশ্যমান ছিল। বাংলার অধিকাংশ মানুষের বাস ছিল বাঁশ আর খড়ের তৈরি ঘরে। বাঁশ ও কাঠের তৈরি ঘরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা বাস করত। বাংলায় দীর্ঘ দিনের প্রচলিত বাঁশের ঘরের গঠন রীতি ইটের তৈরি স্থাপত্য রীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এভাবে বহিরাগত মুসলমানদের স্থাপত্যরীতির নিজস্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্থানীয় নির্মাণ শৈলীর মিশ্রণ ঘটে। যে কারণে ইটের তৈরি ইমারতে গ্রাম বাংলার প্রচলিত দোচালা বা চারচালা ঘরের আদল লক্ষ করা যায়। সুলতানি যুগের স্থাপত্য নির্মাণে নির্মাতাগণ স্থানীয় নির্মাণ শিল্পীদেরও নিয়োগ করতেন। ফলে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে মুসলিম স্থাপত্যে বাঙালির স্থাপত্য শৈলীর ধারণা সহজেই প্রবেশ করেছিল। তাই এ যুগের ইটের তৈরি ইমারতে চৌচালার মতো ঢালু ও বাঁকা আকৃতির ছাদ নির্মিত হয়। এ ধারার প্রাচীনতম নিদর্শন ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ। চৌচালা আকৃতির ছাদ নির্মাণের উদাহরণ এখানে দেখা যায়। এর প্রায় দুশো বৎসর পর মোগল যুগে গৌড়ে নির্মিত হয়েছিল ফতেহ খানের সমাধি। এই সমাধি গৃহের ছাদটি ছিল দোচালা আকৃতির।

মুসলমান বসতির আবশ্যিক অঙ্গ ছিল মসজিদ, কারণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া মুসলমানদের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় বিধান। মসজিদ ছিল মুসলমানদের নামাজ বা প্রার্থনা গৃহ। একারণেই মধ্যযুগের সূচনা থেকে মুসলিম স্থাপত্য বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। মসজিদের পরই মুসলমানদের দ্বিতীয় আবশ্যিক স্থাপনা হচ্ছে মাদ্রাসা। মুসলিম সাধক ও শাসকদের সমাধিও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে বিবেচিত।

সুলতানি যুগের ইমারতে মুসলমানদের নির্মাণ শৈলীর বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। এগুলো হচ্ছে খিলান, মিনার ও মিহরাব। স্থাপত্য নির্মাণে এদেশের জলবায়ুর ওপর দৃষ্টি রাখা হয়েছে। আর্দ্র জলবায়ুর দেশ বলে মসজিদের ভেতর প্রশস্ত নামাজ

কক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের প্রয়োজন ছিল। তাই কিবলা বা পশ্চিম দিক ছাড়া অন্য তিন দিকের দেয়ালে পর্যাপ্ত দরজা ও জানালা কাটা হতো। বৃষ্টির পানি যাতে সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তাই দরজাগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট করে বানানো হতো। মসজিদে বড় আকৃতির প্রবেশ দ্বার নির্মিত হয় মোগল আমলে।

সুলতানি যুগের মসজিদে গম্বুজ ও খিলান ব্যবহারে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন কোথাও দেখা যায় এক গম্বুজ বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি মসজিদ, কোথাও এক গম্বুজ মসজিদের সামনে বারান্দা বা বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। সমাধিগুলো সাধারণত এক গম্বুজ রীতিতে তৈরি হতো। পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৭-১৩৮৯ খ্রি.) সমাধি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ত্রিবেণীর সাতগাঁও ও হুগলী জেলার ছোট পাণ্ডুয়াতে এ ধরণের অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। চমৎকার খিলানে শোভিত এ সকল মসজিদে একাধিক গম্বুজ থাকতো। পোড়ামাটির অলংকরণ শোভিত ছিল মিহরাবগুলো, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ এ রীতির সর্বোত্তম উদাহরণ। এটি মধ্যযুগে বাংলার সর্ববৃহৎ মসজিদ স্থাপত্য। ইটের পাশাপাশি এখানে পাথরেরও ব্যবহার লক্ষণীয় ছিল।

ষোল শতকের প্রথমার্ধে বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসান ঘটলে স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন আসে। মোগল যুগে বাংলা দিল্লির একটি প্রদেশ বা সুবায় পরিণত হয়। দিল্লির মোগল সম্রাট এবং তাদের নিয়োজিত সুবাদার ও আমীর ওমরাহদের তত্ত্বাবধানে এ সময় ইমারত নির্মিত হতে থাকে। ফলে এই নির্মাতাদের উপর স্থানীয় রীতি তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি। দিল্লির আগ্রা ও ফতেহপুর সিক্রিতে যে ধারায় মোগল স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে তারই অনুকৃতি দেখা যেতে থাকে বাংলার মোগল স্থাপত্যে। শুধু ব্যতিক্রম ছিল উত্তর ভারতের স্থাপত্যে ব্যবহৃত মর্মরপাথর ও লাল বেলেপাথরের বদলে ইটের ব্যবহার। সুলতানি যুগে দেয়ালকে আবৃত করতে পোড়ামাটির অলংকরণ বা টেরাকোটার যথেচ্ছ ব্যবহার ছিল। কিন্তু টেরাকোটা বিলুপ্ত হয়ে যায় মোগল যুগে। কারণ এ সময়ে চুন-সুরকিতে প্লাস্টার করার পদ্ধতি আয়ত্ব করে ফেলে নির্মাণ শিল্পীরা। খিলানগুলো এসময় নানা বর্ণের চিত্র ও কারুকার্যে সজ্জিত করা হতে থাকে। মোগল যুগের ইমারতগুলোর প্রবেশ মুখে বিশাল ও জমকালো তোরণ নির্মিত হতে থাকে। মোগল যুগের মসজিদের খিলান ও গম্বুজে আসে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যা দেখে সুলতানি যুগের মসজিদ থেকে সহজেই একে আলাদা করা যায়। ঢাকায় নির্মিত বাংলা একাডেমির কাছে হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদ, লালবাগ দুর্গের ভেতর ফররুখশিয়ার মসজিদ (লালবাগ শাহী মসজিদ) মোগল মসজিদের উদাহরণ।

ধর্মীয় ইমারতের বাইরেও মোগল যুগে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাধারণ ইমারত তৈরি হতে থাকে। এর মধ্যে কাটরা এর অন্যতম উদাহরণ। মোগল যুগের বাংলায় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এবং বিশেষ করে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কয়েকটি জলদুর্গ তৈরি করা হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গ, নারায়ণগঞ্জের হাজিগঞ্জ ও সোনকান্দা দুর্গ। লালবাগ প্রাসাদ দুর্গও মোগল বাংলার অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন। মোগল যুগে বিশেষ করে নবাবী আমলে বেশ কয়েকটি প্রাসাদও নির্মিত হয়েছিল। এরমধ্যে মুর্শিদাবাদে নবাবদের ইমারতসমূহ বিশেষ স্থাপত্য সৌকর্যের প্রমাণ বহন করছে। এসব ছাড়াও মোগল যুগে অনেক সেতু, খানকাহ ও ইমামবাড়া তৈরি হয়েছে।

মোগল শাসনযুগের শেষ দিকে হিন্দু জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে মন্দির নির্মিত হতে থাকে। মন্দিরগুলোতে ধর্মীয় কাহিনী উপজীব্য করে নানা অলঙ্করণে শোভিত করা হতো। দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির ও পুঠিয়ায় নির্মিত কয়েকটি মন্দিরের অলংকরণে কৃষ্ণ কাহিনীর নানা চিত্র এবং পৌরাণিক ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যত্র এ ধারার অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোগল বাংলার স্থাপত্যের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।

সারাংশ

মধ্যযুগের বাংলার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এসময়ের নানা স্থাপত্য কলার বিকাশ। সুলতানি ও মোগল পর্বে নির্মিত স্থাপত্য কলায় অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছিল। সুলতানি যুগের স্থাপত্যসমূহের বড় জায়গা জুড়ে আছে মসজিদ স্থাপত্য। এ পর্বে পলেস্তারা করার ধারণা না থাকায় দেয়ালের গায়ে কারুকার্য খচিত পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করা হতো। সুলতানি যুগের ইমারত-শৈলীতে দেশীয় রীতির প্রভাব স্পষ্ট ছিল। মোগল পর্বে ধর্মীয় ইমারতের পাশাপাশি নানা লৌকিক ইমারতও নির্মিত হয়। উত্তর ভারতের নির্মাণ শৈলীর প্রভাব এসব স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সুলতান সিকান্দার শাহের সমাধি কোথায় অবস্থিত?
ক) সোনারগাঁও খ) পাণ্ডুয়া
গ) গৌড় ঘ) বাগেরহাট

২। সুলতানি স্থাপত্য নির্মাণের প্রধান উপকরণ কী ছিল?
ক) কাঠ খ) পাথর
গ) ইট ঘ) সুড়কি

৩। মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন–
i. লালবাগ প্রাসাদ দুর্গ মোগল বাংলার অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন
ii. মোগল যুগে অনেক সেতু, খানকাহ ও ইমামবাড়া তৈরি হয়েছে
iii. পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ মধ্যযুগে বাংলার সর্ববৃহৎ মসজিদ স্থাপত্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক একটি জনপদের শাসক। তার প্রতিনিধি খ তার অধীনে অন্য একটি জনপদের দায়িত্ব লাভ করেছে। সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল দেখে হঠাৎ খ বিদ্রোহ করে বসে। তারপর অনেকটা স্বাধীন দেশ হিসেবে সে স্বাধীন করতে থাকে। তার দীর্ঘদিনের শাসনে সেখানে অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়। উদ্দীপকের এ অংশের আলোকে উত্তর দিন–

ক. সুলতানি আমলে বাংলায় কী ধরণের স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল? ১
খ. সুলতানি ও মোগল আমলে নির্মিত মসজিদগুলোর মূল নির্মাণ উপকরণ কী ছিল? ২
গ. সুলতানি ও মোগল আমলে নির্মিত মসজিদগুলোর কোনো পার্থক্য আছে কী? ৩
ঘ. ধর্মীয় স্থাপত্যের বাইরে মোগল আমলে আর কী কী তৈরি হয়েছিল? ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ১। ক ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক